ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1418-1425
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

পতঞ্জল যোগ দর্শনে আত্মার বন্ধন থেকে মুক্তি: একটি আলোচনা

উজ্জ্বল হালদার, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.06.2025; Accepted: 23.06.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstact

In India, the tradition of Yoga is as ancient as the vedic period itself, and subsequently most of the systems of philosophy accepted it as a sure Path for the realization of the supreme truth of human life. Yoga philosophy posits that the human condition is characterized by a state of bondage and and the ultimate goal is to attain liberation. Bondage in this context refers to the limitations imposed by the mind, ego, and attachments, leading to suffering and entanglement in the cycle of birth, death, rebirth. The root cause of this bondage is ignorance (avidya). Liberation represents ultimate freedom from suffering. It's a state of profound peace, wisdom, and unity with the the divine consciousness. Yoga provides a systematic and practical approach to achieve this liberation. The eightfold path of Ashtanga Yoga helps to achieved liberation. A key principle in achieving liberation is Vairagya (detachment), which means engaging in life's activities without being attached to the outcomes. This cultivates inner peace and helps in transcending the limitations of the ego. Ultimately, the goal is to become a liberated being (jivanmukta), one who moves through life is ease, unaffected by external circumstances, and unconditional love and compassion.

Keywords: Yoga, Self, Bondage and Liberation, Chittavritti, Chittavhumi, and Ashtanga Yoga

ভারতীয় দর্শন হল মূলত আধ্যাত্মিকতার দর্শন। ভারতীয় দর্শনে যোগ দর্শনের প্রভাব অপরিসীম প্রভাব লক্ষণীয়। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল সম্ভবত ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মানা হয়। 'যুজ' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঙ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'যোগ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'যুজ' ধাতুর অর্থ নানা রকম হয়, যেমন- সংযোগ, সমাধি ইত্যাদি। তাই ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'যোগ' শব্দের অর্থ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ। পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ 'যুক্ত হওয়া' অর্থে ব্যাবহার করেননি। তিনি ' ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে'ও যোগ বলেননি। পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দটি 'সমাধি যোগ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' চারটি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে রয়েছে একান্নটি সূত্র, দ্বিতীয় পাদে রয়েছে পঞ্চান্নটি সূত্র, তৃতীয় পাদে রয়েছে পঞ্চান্ন সূত্র এবং চতুর্থ পাদে রয়েছে চৌত্রিশটি সূত্র। সমাধিপাদে যোগের স্বরূপ, প্রকার ও লক্ষ্য আলোচিত হয়েছে। সাধনপাদে সমাধি লাভের উপায় হিসেবে ক্রিয়াযোগ, বিভিন্ন ক্লেশ, কর্মফল, ত্রিবিধ দুঃখ, তার কারণ, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় আলোচিত হয়েছে। বিভূতিপাদে যোগের অন্তরঙ্গ দিক এবং যোগের মাধ্যমে লব্ধ নান অলৌকিক শক্তি আলোচিত হয়েছে। আর কৈবল্যপাদে কৈবল্য বা মুক্তির স্বরূপ ও প্রকার , পুরুষের সত্তা আলোচিত হয়েছে।

যোগের প্রাচীনতার সমর্থনে বলা যায় যে, শ্রুতিতেও যোগের বিধান বহুস্থানে বিদ্যমান। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (জ্ঞান লাভেচ্ছু যোগী) বাক্ কে (বহিরিন্দ্রিয় সকলকে) মনে নিরুদ্ধ করবে, মনকে বুদ্ধিতে নিরুদ্ধ করবে।[১] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে- "এই যোগ সাধনে প্রাণ বায়ুকে সংযত করে, শরীরকে স্থির করে অবস্থান করবেন এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হলে নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করবেন। এই প্রকারে জ্ঞানী ব্যাক্তি মনকে সংযত করবেন।"[২] এর থেকে বোঝা যায় যোগ প্রয়োগ বিদ্যা হিসাবে অতি প্রাচীন। মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হতে যোগী পুরুষের আবক্ষমূর্তি পাওয়া গেছে। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগের এক অতিপ্রাচীন ইতিহাস অর্জুনের কাছে বিবৃত করে বলেছেন-

"বুদ্ধযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"।।[৩]

অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী ঐহিক জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় হতে মুক্ত হন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো। কর্মের কৌশলই যোগ। শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার যোগের উল্লেখ আছে, যেমন- মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি। যোগ মুখ্যত প্রয়োগশাস্ত্র। যোগ দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল, কী কৌশলের দ্বারা, কোন্ জ্ঞানার্জনের দ্বারা বা কোন্ সাধনার দ্বারা মনের বশ্যতা-জাল থেকে মুক্ত হওয়া যায় তা বলা হয়েছে।

পতঞ্জলি যোগ দর্শনে যোগের লক্ষণে বলেন- "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[৪] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হল যোগ।যোগ দর্শনে বলা হয়, আত্মা স্বরুপত বিশুদ্ধ চৈতন্য বিশিষ্ট। অর্থাৎ আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়। আত্মা হল এক বিশুদ্ধ চৈতন্য। আত্মা ও অনাত্মার বিষয়ের ভিন্নতার উপলব্ধি সম্ভব বিবেক জ্ঞানের দ্বারা। বিষয়ের সঙ্গে যখন চিত্তের সংযোগ ঘটে তখন চিত্ত বিষয়টির আকার গ্রহন করে। চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্তিকেই বলা হয় চিত্তবৃত্তি। জীবের অজ্ঞানতাকে দূরকরা এবং বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তের বৃত্তিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করার যে উপায় তাই হল যোগ। আত্মা ও অধ্যাত্মবিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য যোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বেদে, উপনিষদে, স্মৃতিতে, পুরাণে এবং প্রায় সব ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃতি হয়েছে, মুক্তি লাভের পথে যোগ দর্শন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া খুবই সহায়ক। মনে যদি স্থিরতা ও শুচিতা না থাকে তবে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং যোগ দর্শন নির্দিষ্ট সাধনাই আত্ম শুদ্ধির প্রশস্ত পথ।

আত্মার স্বরূপ: সাংখ্য ও যোগ মতে, আত্মা হল স্বরূপত মুক্ত। জীব হল স্থূল ও সূক্ষ শরীর বিশিষ্ট আত্মা। স্থূল বা সূক্ষ শরীর বা চিত্ত কারও সঙ্গে আত্মা সম্পর্ক যুক্ত নয়। অবিদ্যা বশত আত্মা নিজেকে চিত্ত বলে মনে করে। এজন্য আত্মা চিত্তের পরিণামকে নিজের পরিণাম বলে মনে করে। যদিও একথা স্বীকার্য যে, আত্মা নিজে অপরিণামী। চিত্ত স্বরূপত অচেতন, তবে আত্মার চৈতন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলে, তাকে চেতন বলে মনে হয়। চিত্তের সঙ্গে যখন কোন বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখন চিত্ত বিষয়াকার ধারণ করে। চিত্তের বিষয়াকার ধারণের নামই হল বৃত্তি। চিত্তের এই বৃত্তিকে সাধারণত জ্ঞান বলা হয়। যেমন- আকাশের চাঁদ গতিহীন হলেও, যদি তা গতিশীল জল তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়, তাহলে চাঁদকেও গতিশীল রূপে মনে করা হয়। চিত্তের এই বৃত্তির মাধ্যমেই আত্মার এই বিষয় সর্ম্পকে জ্ঞান হয়। আত্মার কোনো বিকার বা পরিবর্তন না থাকলেও আত্মা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলে, চিত্তের বৃত্তি আত্মার বৃত্তি বলে মনে হয়। আত্মা স্বরূপগত বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং চৈতন্যের বিকার সম্ভব নয়- চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মারই বিকার হয়। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মাই, অবিদ্যাবশত নিজেকে ঐসব বৃত্তি জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এই অবস্থাই হচ্ছে আত্মার বদ্ধ অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় পুরুষ বা আত্মা পঞ্চক্লেশে ক্লিষ্ট হয়। আর এই বন্ধন মুক্তির জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীনরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এই অবস্থাই হচ্ছে যোগ বা সমাধি। চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হলে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং পুরুষ বা আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় হচ্ছে মুক্তি বা কৈবল্যের অবস্থা। জীবের কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য তাই চিত্তবৃত্তি নিরোধের অর্থাৎ যোগ সমাধির প্রয়োজন হয়।

চিত্তবৃত্তি: সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধি, অহংকার ও মন- এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সমষ্টিকেই যোগ দর্শনে চিত্ত বলা হয়। সাংখ্য দর্শনের মতো যোগ দর্শনেও বলা হয়েছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রথম বিকার হল- মহৎ বা বুদ্ধি। এই মহৎ বা বুদ্ধির বিকার হল অহংকার। আর অহংকারের বিকার হল মন। আর এই গুলিকে একসঙ্গে বলা হয় চিত্ত।

যোগ মতে চিত্তের বৃত্তি হল চিত্তবৃত্তি। বৃত্তি শব্দের অর্থ হল পরিণাম। সুতারাং চিত্তের বৃত্তি বা পরিণামকেই বলা হয় চিত্তবৃত্তি। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু চিত্তের বিষয়াকারে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন ঘটের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন চিত্ত ঘটের আকার ধারণ করে। তখন চিত্তের বৃত্তি হল- ঘটাকারবৃত্তি। এই রকম অবস্থায় চিত্তের উপর আত্মার চৈতন্য প্রতিফলিত হলে, আত্মারও ঘটাকার বৃত্তি হয়এবং তার ফলে ঘট জ্ঞান হয়। চিত্তবৃত্তি হল একপ্রকার জ্ঞানরূপ অবস্থা বা আকার। এই জন্যই চিত্তবৃত্তিকে সাধারণত জ্ঞান রূপে অভিহিত করা হয়।

যোগমতে, বিষয়ের সংখ্যা অসংখ্য এবং এ জন্যই চিত্তের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগহেতু চিত্তে অসংখ্য বৃত্তির জন্ম হয়। চিত্তের এই বৃত্তিগুলিকে পাঁচ ভাবে ভাগ করা যায়- "প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিয়"[৫] অর্থাৎ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান, বিপর্যয় বা ভ্রান্ত জ্ঞান, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। যথার্থ জ্ঞানকেই প্রমা বলা হয়। আর যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে বলা হয় প্রমাণ। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণামি"[৬] অর্থাৎ প্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। এই প্রত্যক্ষকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়- বাহ্য এবং অন্তর। বাহ্য বস্তু যথা- চক্ষুর দ্বারা ঘাসের সবুজ বর্ণকে প্রত্যক্ষ করা হল বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি এবং মন রূপ অন্তঃন্দ্রিয় দিয়ে চিত্তের যে মানসিক অবস্থা সমূহের জ্ঞান, যেমন- সুখ,দুঃখ তা অন্ত: প্রত্যক্ষবৃত্তি। পূর্ব দৃষ্ট কোন বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে ব্যপ্তিজ্ঞানের ভিত্তিতে অদৃশ্য কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ হয় তাই হল অনুমান। যেমন- ধূম দেখে অদৃশ্য অগ্নির উপস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হল অনুমান। আপ্তবাক্য বা বিশ্বাসযোগ্য কোনো মানুষের বাক্য শ্রবণ করে যে জ্ঞান হয় তাকে শব্দ জ্ঞান বলে। বিপর্যয়ের লক্ষণে বলা হয়- "বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্"[৭] অর্থাৎ বিপর্যয় হল মিথ্যা জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি বিষয়ের অনুরূপ না হয়ে যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে তা হয় ভ্রান্তজ্ঞান বা বিপর্যয়। যেমন- রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হচ্ছে ভ্রান্ত জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান। রজ্জুর স্থলে চিত্ত রজ্জুর আকার গ্রহন না করে সর্পের আকার গ্রহন করে বলে 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' মিথ্যা জ্ঞান।"শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"[৮] অর্থাৎ যে জ্ঞান কেবল শব্দশ্রয়ী এবং যেখানে সেই শব্দের অনুপাতে কোনো বস্তুর উপস্থিতি থাকে না, চিত্তের সেই বৃত্তি বা জ্ঞানকেই বলা হয় বিকল্প। যেমন- আকাশ কুসুম বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবুও ঐ শব্দটি শোনামাত্র আমাদের একপ্রকার জ্ঞান হয়, তাই হল বিকল্প। বিকল্প বিষয় শূন্য জ্ঞান। যোগ দর্শনে নিদ্রার লক্ষণে বলা হয়েছে, "অভাব-প্রত্যয়-আলম্বণাবৃত্তিঃ নিদ্রা"[৯] অর্থাৎ নিদ্রার সময় জ্ঞানের অভাব বিষয়ক যে জ্ঞান বৃত্তির সঞ্চার হয় তাকেই নিদ্রাবৃত্তি বলে। যোগ দর্শনে নিদ্রা বলতে সুপ্তিকে বোঝায়। অনেকের ধারণা নিদ্রায় জ্ঞান হয় না, এটা কিন্তু ভূল ধারণা। যোগ দর্শন মতে নিদ্রাতেও জ্ঞান হয়। নিদ্রায় যদি কোন অভিজ্ঞতা না হয় তাহলে নিদ্রাভঙ্গের পর কোন লোক যদি বলে 'তার সুনিদ্রা হয়েছিল'- তাহলে বুঝতে হবে যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সে বলতে পারছে। আর এটা থেকেই বোঝা যায়, নিদ্রা অবস্থা একেবারে জ্ঞানহীন অবস্থা নয়। নিদ্রার সময়ও একপ্রকার অনুভূত হয়। সুতরাং নিদ্রাও একরকম মনের বৃত্তি। আবার স্মৃতির লক্ষণে যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, "অনুভূত বিষয় অসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ"[১০] অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার সম্পৃক্ত বৃত্তিই হল স্মৃতি। পূর্বের কোনো অনুভূত বিষয়কে প্রতিরূপের আকারে মনে ধরে রাখার ক্ষমতায় হল সংস্কার। আর এই সংস্কারের পুনরুজ্জীবনই হল স্মৃতি। পূর্ব-অভিজ্ঞতার ঘট এখন সামনে উপস্থিত নেই তবুও যদি সেই ঘটের পূর্ব সংস্কারের উদ্রেক হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘটাকার বৃত্তির উদ্রেক হয়। এখানে ঘটের অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কারের জ্ঞান বা বৃত্তিই হল স্মৃতি। যোগ দর্শনে এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির অতিরিক্ত আর কোন বৃত্তি নেই। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা- ক্লিষ্টরূপ এবং অক্লিষ্টরূপ। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি ক্লেশ দায়ক আর অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি হল অক্লেশ দায়ক। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি হল- কর্মসংস্কার সমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট। অন্যদিকে যে বৃত্তির মূলে বিবেক জ্ঞান লক্ষিত হয় তাকে অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি বলে। যোগ মতে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ এবং রাগ প্রভৃতি ক্লেশের হেতু হওয়ায় সেগুলি ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিরূপে গণ্য হয়। কিন্তু ভক্তি, শ্রদ্ধা, করুণা এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি ক্লেশ নাশক হেতু রূপে গণ্য হওয়ায় এগুলি অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি রূপে গণ্য হয়।

যোগ দর্শনে পাঁচ প্রকার ক্লেশের কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটি ক্লেশ হল- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। যোগ মতে সমস্ত ক্লেশের মূলেই আছে অবিদ্যা। অবিদ্যার ব্যাখ্যায় যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসুনিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"[১১] অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্য বলে, অশুচিকে শুচি বলে, দুঃখকে সুখ বলে এবং অনাত্মাকে আত্মারূপে বোধিই হল অজ্ঞনতা। যে বস্তু যা নয়, তাকে সেইরূপে জানাই হল অবিদ্যা।

অস্মিতা হছে অহং-অভিমান। আত্মা ও চিত্তের অভিন্নতা বোধ থেকে অহং অভিমান উৎপন্ন হয়। যোগ দর্শনে অস্মিতার লক্ষণে বলা হয়েছে-"দৃকদর্শন শক্তিঃ একাত্মতৈব অস্মিতা"[১২] অর্থাৎ দৃঢ়শক্তি এবং দর্শন শক্তির একাত্মতার জ্ঞানই হল অস্মিতা। আত্মা ও পুরুষ হল দৃক্ শক্তি সম্পন্ন, কিন্তু বুদ্ধি হল দর্শন শক্তি সম্পন্ন। ফলত আত্মাকে যখন বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয় তখনই জাগ্রত হয় অস্মিতা। আর এই অস্মিতার ফলেই আত্মা বা পুরুষ নিজেকে অহং অভিনন্দনে জ্ঞাতা, কর্তা ভোক্তা বলে মনে করে। আবার যোগ দর্শনে রাগের লক্ষণে বলা হয়েছে, "সুখানুশয়ী রাগঃ"[১৩] অর্থাৎ সুখানুশায়ী ক্লেশকেই বলা হয় রাগ। রাগ হল আসক্তি। এই আসক্তি হল সুখকর। সুখকর বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তিই রাগ। রাগের সম্পূর্ণ বিপরীত হল দ্বেষ। যোগসূত্রে দ্বেষের লক্ষণে বলা হয়েছে, "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ"[১৪] অর্থাৎ দুঃখানুশায়ী ক্লেশকেই বলা হয় দ্বেষ। দূঃখ দায়ক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণাই হল দ্বেষ। অভিনিবেশ হল মৃত্যুর প্রতি ভয়। যোগসূত্রে বলা হয়েছে, "স্বরবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়ো অভিনিবেশঃ"[১৫] অর্থাৎ অবিদ্যানের ন্যায় বিদ্যানেরও যে সহজাত ও প্রসিদ্ধ ক্লেশ লক্ষিত হয় তাই হল অভিনিবেশ। সমস্ত ভয়ের মধ্যে মৃত্যু ভয় সব চেয়ে তীব্র। বারবার মৃত্যুভয় ভোগ করায় চিত্ত একপ্রকার বাসনা বদ্ধমূল হয় এবং সেই বাসনাকেই বলা হয় স্বরস। এই স্বরসই জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের মধ্যে মৃত্যু ভয় জন্মায়। এইভাবে ভয়ই মরণের প্রতি বিতৃষ্ণা বৃত্তির উদ্ভব ঘটায়, একেই বলে অভিনিবেশ, যা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ- এই পাচটি ক্লেশের দ্বারা চিত্ত পীড়িত হয়। তাই ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করতে না পারলে যোগ - সমাধির দ্বারা আত্মার কৈবল্যলাভ সম্ভব হতে পারে না। পতঞ্জলির মতে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ সম্ভব। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করতে পারলে যোগ- সমাধির দ্বারা পুরুষ কৈবল্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

চিত্তভূমিঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের প্রাধান্য ও ক্রিয়া অনুসারে চিত্তের স্তরভেদ হয়েছে। চিত্তের এই স্তরকে 'ভূমি' বলা হয়। যোগ দর্শন মতে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার, যথা- ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের প্রথম স্তর হল ক্ষিপ্তভূমি। যে ভূমিতে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় অবস্থান করে, সেই ভূমিকেই ক্ষিপ্তভূমি বলে। ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য হেতু চিত্ত কোন বস্তুতেই স্থিরভাবে অবস্থান করতে পারে না। এরফলে চিত্ত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ছুটে বেড়ায়। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তার জন্য যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন চিত্তে তার অভাব থাকে। যোগ সাধনের জন্য তাই ক্ষিপ্তভূমি সহায়ক নয়। মূঢ় অবস্থায় চিত্তের তমোগুণের প্রাধান্য হেতু চিত্ত কামক্রোধাদিরিপুর অধীন থাকে এবং তন্দ্রা, নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতিতে নিমজ্জিত থাকে।এই অবস্থায় চিত্তের ভালো মন্দের, কর্তব্য-অকর্তব্যের বোধ বুদ্ধি থাকে না। এখানে দেখা যায় ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে। বিক্ষিত অবস্থায় চিত্ত মাঝে মাঝে কোন কোন বিষয়ে স্থির হয়। চিত্তের কখনো স্থির এবং কখনো অস্থির অবস্থার নামই বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিত অবস্থায় চিত্ত তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও রজোগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তের যে স্থিরতা থাকে তা অল্প সময়ের জন্য থাকায় স্থায়ী চিত্তসংযম হয় না। আর যে অবস্থায় চিত্ত রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয় এবং সত্ত্বগুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষিত হয়, সেই অবস্থাকেই বলা হয় একাগ্র চিত্তভূমি। একাগ্র অবস্থায়চিত্ত কোন বস্তুতে স্থিরভাবে মনঃসংযোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে চিত্ত একটিমাত্র বিষয়েই সমাহিত থাকে। একাগ্রচিত্তভূমিতে একটিমাত্র বিষয়ে সমাহিত হলেও কখনোই সম্পূর্ণভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না। তবুও চিত্তের এই অবস্থা অবশ্যই যোগের অনুকূল। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের সকল রকমের বিকার নষ্ট হয়ে যায়।এই অবস্থায় একাগ্র বৃত্তিরও নিরোধ ঘটে। ফলে চিত্ত বৃত্তিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চিত্ত পরিপূর্ণভাবে শান্ত ও সমাহিত থাকে।

চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত- এই তিন অবস্থা যোগ সাধনার উপযোগী নয়। কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় যোগ সাধনা সম্ভব এবং এই দুই অবস্থায় মোক্ষলাভের পক্ষে উপযোগী। আবার এদের মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থায় হল প্রধান। যোগ সাধনায় প্রকৃষ্ট অবস্থা হল নিরুদ্ধ। যোগ বা সমাধি দুই প্রকা, যথা- সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র অবস্থকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়, কারণ এই অবস্থায় আরাধ্যবস্তু সম্যক্ রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা হয়, কারণ এই অবস্থায় চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।

যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অষ্টাঙ্গযোগানুশীলনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগের লক্ষণে বলা হয়েছে- "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধি"[১৬] অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি- এই আটটি হল অষ্টাঙ্গ যোগ। এই অষ্টাঙ্গযোগ শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার

সাথে অনুশীলন করলে সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত দুই প্রকার সমাধি লাভ করা যায়। যমঃ যম হলো একপ্রকার নিষেধাত্মক বিধি। যম সম্পর্কে যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমঃ"[১৭] অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি সাধনকে বলা হয় যম। অহিংসা বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে অন্যকে আঘাত না করা বোঝায়। অহিংসা হল সমস্ত রকম হিংসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অহিংসার একটি ইতিবাচক দিকও আছে সেটি হল মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রসুলভ আচরণ করা, প্রেম-ভালোবাসা বিতরণ করা। তবে যোগীরা যেভাবে অহিংসা ব্রত পালন করতে পারে, সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব নয়। প্রত্যহিক জীবনে জীবন-যাত্রা নির্ধারণের জন্য জীবের প্রাণ হানি করতেই হবে। তবে সাধারণভাবে এগুলিকে হিংসা বলে গণ্য করা হয় না। কেননা, দেহ ধারণের জন্য কিছু না কিছু খেতে হবেই। প্রতি পদক্ষেপে কিছু জীবাণুর প্রাণহানি হবেই। এমনকি যোগী যদি গৃহস্থের বাড়িতে অসময়ে ও অনাহূতভাবে অন্নগ্রহন করলেও তা একপ্রকার পীড়ন করা হয়। তাই এক্ষেত্রে যোগী পুরুষদের বিধান দেওয়া হয় যে, যথাসম্ভব হিংসাকে বর্জনের সংকল্প করে চিত্তশুদ্ধ করবেন। সত্য বলতে বোঝায় বাক্য বা কাজে মিথ্যাচরণ না করা। কোন উদ্দ্যেশ্য সৎ হলেও মিথ্যা বলা যাবে না। সত্য অপ্রিয় হলেও মৌনতা অবলম্বণ করা ভালো। অল্প কথা বলা ও সত্য সাধনের একটি অঙ্গ। তাই সধককে অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় ভাষণ এবং অতি ভাষণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। তাই যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্"[১৮] অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠা জন্মিলে, সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা না বললে বাক্য সিদ্ধি হয়। অস্তেয় বলতে বোঝায় অপরের দ্রব্য গ্রহন না করা। যা নিজের জিনিস নয় তাকে কখনোই নিজের দ্রব্য বলে গ্রহন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- "অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"[১৯] অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চৌর্য ত্যাগ হলে সমস্ত রত্নই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় সমস্ত রকম কামভোগাদিতে সংযম। ব্রহ্মচর্য হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযম। এর জন্য প্রয়োজন অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে মিথাহার এবং মিতনিদ্রা অভ্যাস করতে হবে। মন থেকে সমস্ত রকম কাম বিষয়ক কল্পনা বিলাস ত্যাগ করতে হবে। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ"[২০] অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম হয়েছেন, যিনি সর্বোতভাবে ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার অতুল বিক্রম, অদ্ভূত শক্তিলাভ হয়েছে। অপরের কাছে কোন কিছু গ্রহন না করা হল অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ পালন না করলে ভোগের বিষয়ে সবসময় চিন্তা করলে যোগসিদ্ধি লাভ করা যাবে না। অধিক ভোগ্যবস্তুর অধিকারী হলে যোগসিদ্ধি লাভ করা দুষ্কর হয়ে উঠবে। তাই যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাংবোধ"[২১] দৃঢ়রূপে অপরিগ্রহ বৃত্তির স্ফূরণে যখন সর্বত্যাগ হয়, তখন নিজের সকল জন্মবৃত্তান্তই সুগোচর হয়। নিয়মঃ নিয়ম হল নিয়মত অভ্যাস ও ব্রতপালন। যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানি নিয়মাঃ"[২২] অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে বলা হয় নিয়ম। শৌচ দুই প্রকার- বাহ্য শৌচ এবং আভ্যন্তর শৌচ। বাহ্য শৌচ হল প্রতিদিন স্নান করা, স্বাত্ত্বিক আহার গ্রহন ইত্যাদি। আভ্যন্তর শৌচ হল মন থেকে কুচিন্তা পরিহার করে সুচিন্তার অনুশীলন করা। অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান এবং হিংসা ইত্যাদি চিত্তের মলিনতা থেকে মুক্ত হওয়া। অহেতুক আকাঙ্খা বর্জন করে যা পাওয়া যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার নামই হল সন্তোষ। তপঃ বলতে তপস্যাকে বোঝায়। তপস্যার দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতোষ্ণদি প্রভৃতি সয্য করে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন অর্থাৎ উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যায়ন করাই হল স্বাধ্যায়। আর এই মোক্ষশাস্ত্র অধ্যায়নের ফলে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ হয় এবং পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বাড়ে। ঈশ্বরের চিন্তা, সকল কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। অষ্টযোগাঙ্গে আসনের লক্ষণে বলা হয়েছে- "স্থিরসুখনম্ আসনম্"[২৩] অর্থাৎ দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্থির রেখে নিশ্চলভাবে সুখজনক অবস্থায় উপবেশনই হল আসন। দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখা যায় আসনের দ্বারা। আসন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন- পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, দন্ডাসন প্রভৃতি। শারীরিক নিয়ন্ত্রণ এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আসন অভ্যাস করা প্রয়োজন। যোগসূত্রে প্রাণায়ামের লক্ষণে বলা হয়েছে- "অস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ"[২৪] অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতির যে বিচ্ছেদ তাকেই বলে প্রাণায়াম। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস একটি ছন্দ অনুসারে বিরামহীনভাবে চলে। এই শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে গতি বিচ্ছেদ আনাই প্রাণায়ামের মূল উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম তিন প্রকার- রেচক বা বাহ্যশক্তি, পূরক বা অভ্যন্তর বৃত্তি এবং কুম্ভক বা স্তম্ভবৃত্তি। শ্বাস ত্যাগ করে ভিতরের বায়ুকে বাইরে স্থাপন করাকে রেচক বা বাহ্যবৃত্তি বলে। বাইরের বায়ুকে যখন শ্বাস গ্রহনের মাধ্যমে ভিতরে স্থাপন করা হয় তখন তাকে বলে পূরক বা অভ্যন্তর বৃত্তি।

আর শ্বাস গ্রহন বা বর্জন না করে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকাকেই কুম্ভক বা স্তম্ভবৃত্তি বলে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াশক্তিকে বৃদ্ধি করতে প্রাণায়াম যথেষ্ঠ সাহায্য করে। প্রাণায়ামের ফলে মনোসংযোগ বাড়ে। দীর্ঘদিন প্রাণায়ামের অভ্যাসের ফলে শরীর শুদ্ধ হয়, চিত্ত শান্ত হয়। আর এরফলে যোগের পথ সুগম হয়। যোগসূত্রে প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগ চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ"[২৫] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তানুগামী করাই হল প্রত্যাহার। যদি ইন্দ্রিয় বহির্মুখী হয় তাহলে চিত্তের চাঞ্চল্য দেখা যায়, ফলে যোগের বিঘ্ন দেখা দেবে। আর ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী হলে চিত্তের বিষয়ের আসক্তি বিনষ্ট হয় এবং এরফলে চিত্ত স্থিরভাবে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। ধারণা প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"[২৬] অর্থাৎ চিত্তকে কোন বস্তুতে ধরে রাখাকে ধারণা বলে। শরীরের ভিতরের বা বাইরের কোন বস্তুতে চিত্তকে সংলগ্ন করে কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকাকে ধারণা বলে। অন্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তকে শরীরের মধ্যে নাভিচক্র, নাসিকার অগ্রভাগ প্রভৃতি স্থানে অথবা বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির মূর্তিতে চিত্তকে স্থির রাখাই ধারণা। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ রাখাই হল ধ্যান। ধ্যানের লক্ষণে যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"[২৭] অর্থাৎ ধারণাতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তির স্থির আলম্বন বা একতানতাকেই ধ্যান বলে। ধারণা গভীরতর এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে ধ্যানে পর্যবসিত হয়। যে কোনও বিষয়ে যোগী ধ্যান করতে পারে। ধারণার প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলধারার মতো, আর ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলধারার মতো একতান। সমাধি প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে- "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"[২৮] অর্থাৎ ধ্যান যখন ধ্যেয়ের স্বভাবের আবেশে জ্ঞানাত্মক স্বভাবশূন্য হয় তখন তাকে সমাধি বলে। এটি ধ্যানের চরম উৎকর্ষের অবস্থা। সমাধি চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থ। এই অবস্থাই চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে বিলীন হয়ে যায়। এই অবস্থায় সাধক ধ্যানের বিষয়কে ভিন্নরূপে অনুভব করে না অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু ও ধ্যানকর্তা অভিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেবল পুরুষ বা আত্মাই বিরাজ করে। সমাধিই হল অষ্টাঙ্গযোগের অন্তিম ও সর্বোচ্চ স্তর। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি যোগ হচ্ছে পুরুষের লক্ষ্য, কেননা সমাধি যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। আর এই জন্যই যোগ সাধনায় অষ্টাঙ্গিক যোগ সমাধির প্রয়োজন।

যোগশাস্ত্র মতে সমাধি দুই প্রকার- সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই অবস্থায় চিত্ত একটি বিষয়ে নিবিষ্ট হয় এবং বিষয়টি সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় না। এই স্তরে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে বলে একে সজীব সমাধি বলা হয়। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়- সবিতর্ক সমাধি, সবিচার সমাধি, সানন্দ সমাধি এবং সাস্মিত সমাধি। বাহ্য জগতের স্থূল বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হলে, সেই সমাধিকে সবিতর্ক সমাধি বলে। যেমন- দেব-দেবীর মূর্তিতে যখন চিত্ত নিবিষ্ট হয় তখন সেই সমাধি হল সবিতর্ক সমাধি। আর বাহ্যজগতে স্থূল বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়ার পর চিত্ত যখন তন্মাত্রের মধ্যে বাহ্য সূক্ষ বিষয়ে নিবিষ্ট হয় তখন সেই সমাধিকে বলা হয় সবিচার সমাধি। সবিচার সমাধির পর চিত্ত ইন্দ্রিইয়াদি স্থূল বিষয়ে নিবিষ্ট হলে তখন সেই সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলা হয়। এই সমাধিতে যোগীর সর্বশরীরে এক আনন্দময় সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় বলে একে সানন্দ সমাধি বলে। আধ্যাত্মিক সূক্ষ বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়ার পর অর্থাৎ সানন্দ সমাধির পর চিত্তের আধ্যাত্মিক সূক্ষ বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়াকে বলা হয় সাম্বিত সমাধি। এখানে অহংরূপী ও জ্ঞান স্বরূপ আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন না। এটিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শেষ সমাধি।

অস্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি একে একে নিরুদ্ধ হলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্ভব হয়।এই সমাধিতে কোন বাহ্য বিষয় বা আধ্যাত্মিক বিষয় না থাকায় তা সম্পূর্ণভাবে নিরালম্ব ও নির্বীজ সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই হল প্রকৃত সমাধি, যেখানে পুরুষ বা আত্মা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় হল মুক্ত অবস্থা বা কৈবল্য অবস্থা, যোগ দর্শনে যাকে মোক্ষ বলা হয়েছে। যোগ দর্শনে অস্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সমাধির শেষ স্তর। দীর্ঘকাল যদি যোগাভ্যাস করা যায় তাহলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার- এই পঞ্চ যোগাঙ্গকে যোগের বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়, কেননা এগুলির সেরূপ কোন বিষয় নেই। আর ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি- এই তিনটি হল যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। এদেরকে আবার সংযমও বলা হয়, কেননা এগুলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত।

পরিশেষে তাই বলা যায়, অষ্টাঙ্গিক যোগের দীর্ঘকালীন অনুশীলনের মাধ্যমে সমাধির প্রতিকূল বিষয় সমূহ অপসারিত হয়। ফলস্বরূপ চিত্তের অশুদ্ধি ও মালিন্য দূর হয়। বারংবার অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা জ্ঞানের দীপ্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিবেক খ্যাতির উদ্ভব ঘটে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মাধ্যমে সমস্ত প্রকার দুঃখ ক্লেশের বীজ এবং বৃত্তি সংস্কার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরফলে পুরুষ বা আত্মা চরম বৈরাগ্য লাভে ধন্য হয়। যার ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞানরূপ বিবেকখ্যাতির পরিপক্কতা লাভ করে। ফলত সকল পদার্থ আপন আপন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের সংযোগ থেকে বিমুক্তভাবে অবস্থানকেই বলা হয় প্রকৃতির দিক থেকে কৈবল্য। এরফলে তখন পুরুষ বা আত্মা স্বরাজ্যে অবস্থান করে। বুদ্ধির প্রলয়ের ফলে পুরুষের প্রতিবিম্বপাতের আর কোনো প্রকার সম্ভাবনাই থাকে না। এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই হল পুরুষ বা আত্মার কৈবল্য। আর এই কৈবল্য প্রাপ্তির পর পুরুষ বা আত্মার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, অতুল চন্দ্র (সম্পাদনা)। উপনিষদ (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ: ১১২-১১৩।
২. সেন, অতুল চন্দ্র (সম্পাদনা)। উপনিষদ (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ: ৩৬৯।
৩. স্বামী, বাসু দেবানন্দ (ব্যাখ্যা ও অনুবাদ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০, পৃ: ১৮৯-১৯০।
৪. শর্ম্মা, শ্রী পূর্ণচন্দ্র (সঙ্কলিত)। পাতঞ্জল দর্শন, কলকাতা, ১৮৯৮।
৫. তদেব, পৃ: ২০।
৬. তদেব, পৃ: ২০।
৭. তদেব, পৃ: ২৬।
৮. তদেব, পৃ: ২৭।
৯. তদেব, পৃ: ৩০।
১০. তদেব, পৃ: ৩১।
১১. তদেব, পৃ: ১০৩।
১২. তদেব, পৃ: ১১১।
১৩. তদেব, পৃ: ১১২।
১৪. তদেব, পৃ: ১১৩।
১৫. তদেব, পৃ: ১১৫।
১৬. তদেব, পৃ: ১৬৩।
১৭. তদেব, পৃ: ১৬৪।
১৮. তদেব, পৃ: ১৭৭।
১৯. তদেব, পৃ: ১৭৭।
২০. তদেব, পৃ: ১৭৮।
২১. তদেব, পৃ: ১৭৯।
২২. তদেব, পৃ: ১৬৮।
২৩. তদেব, পৃ: ১৮৫।
২৪. তদেব, পৃ: ১৮৮।
২৫. তদেব, পৃ: ১৯৬।
২৬.তদেব, পৃ: ২০০।
২৭. তদেব, পৃ: ২০১।
২৮. তদেব, পৃ: ২০২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অরণ্য, হরিহরানন্দ। পাতঞ্জল যোগদর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫।
২. শাস্ত্রী ভট্টাচার্য, শ্রীদিনেশচন্দ্র। ষড়দর্শনঃ যোগ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৬।

৩.ভর্গানন্দ, স্বামী। পাতঞ্জল দর্শন। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৮।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকপ্রভা। সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন। সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৬১।
৫. সেন, অতুল চন্দ্র (সম্পাদনা)। উপনিষদ (অখন্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।
৬. শর্ম্মা, শ্রী পূর্ণচন্দ্র (সঙ্কলিত)। পাতঞ্জল দর্শন, কলকাতা, ১৮৯৮।
৭. বেদান্তবাগীশ, শ্রীকালিবর। পাতঞ্জল দর্শন ও পরিশিষ্ট। ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলকাতা, ১২৯১।
৮. ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা, ২০১৮।
৯. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১০।
১০. বসু, রণদীপম। চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন-২। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭।
১১. স্বামী বাসু, দেবানন্দ (ব্যাখ্যা ও অনুবাদ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। উদ্ভোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০।